হামীম কামরুল হক

টয় ও ডল

গল্প

শেষ পর্যন্ত যা ঘটবার তাই ঘটে। কদিন ধরে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ ঠিক বলা যাবে না। ডল দেখা করতে চাইছে না। এখন অবশ্য ডল নিজেই একটা ব্র্যান্ড। কিন্তু কোনোরকম ঠাটবাট নিয়ে চলেনি। কারো সঙ্গে এতটুকু অভদ্রতা করে না। কেউ বলতে পারবে না, এত চাহিদা হওয়ার তালে তালে ফুটানিও বেড়ে চলছিল। বরং যত তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, যত বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসছে, ততই সে যেন আরো নুয়ে পড়ছে ফলে ভরা গাছের মতো। অথচ এই কদিনে একেবারে বদলে গেছে ডল। আগে সহজে বোঝা যেত। কোনো কিছুতেই কোনো রাখঢাক নেই ডলের। চরিত্রের প্রয়োজনে যা যা দরকার সব করতে পারে। নিজেকে বার বার নানান ধাঁচে ভেঙেছে গড়েছে। তার মতো শিল্পী আগে কি পরে হাতেগোনা ছিল। বলতে গেলে অনেক দিন ছিলই না। পুরো শূন্য একটা জায়গাকে পূর্ণ করে দিয়েছে সোফিয়া ডল। আর ওর প্রতিটি রোমকূপ চেনে টয়। মানে চিনতো। এখন মনে হচ্ছে না ঠিক নয়। এতটা ভেবে ফেলা ঠিক হয়নি। সেই টয় এখন বুঝতে পারছে না তাকে কি ফাঁদেই ফেলে দিল মেয়েটা? নিজের হাতে তাকে তৈরি করেছে। সেই সাগরপুরে কাজ করতে গিয়ে চোখে হঠাৎ চোখে পড়েছিল জমির আল দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে মেয়েটা। তখন কত বয়স হবে। তখন কেবল স্কুল পাস করে কলেজে উঠেছে। সালোয়ার কামিজ পরা। বাতাসে বার বার ওড়না উড়ে গলার কাছটাতে চলে যাচ্ছে। বুকটা তখনই বেশ ভারী। শরীরও বাড়ন্ত খুব। টয় এক ঠায় দেখছিল। তার তাকানোর কিছুক্ষণ পরই মেয়েটা ওড়না বুকে কাছটাতে চেপে ধরে। দৌড় অবশ্য থামায় না। মেয়েদের চোখ সারা শরীরে। যেখানে যতদূর থেকে কেউ তাকাক তারা যেন ঠিক টের পায়। আর টয়ের দৃষ্টির একটা দারুণ ব্যাপার আছে— দৃশ্যটা যেমনই হোক— সে শান্ত চোখে দেখে নিতে পারে বা দেখার সময় চোখ শান্ত রাখতে পারে। ফলে বদনজর, নজর খারাপ— এই ইলজাম তার ওপর লাগানো যাবে না। নিজের জগতেও একটা দারুণ আড়াল সে তৈরি করেছে এই জীবনের শুরু থেকে। ভালো নাম তরিক রাফাত। তাকে তার ওই জগতে সবাই টয় বলেই জানে। নিজে কোথাও পরিচয় দেওয়ার সময় সে 'তরিক রাফাত' পর্যন্তই বলে। বাকিরা তখন বলে, 'আপনিই তো টয়?' তার 'মনমাঝি', 'হারানো ঘাটের কথকতা', 'নিঝুম শহর', 'এই শহরে একজন'— এমন এক একটা ধারাবাহিক কি আর একক নাটকের সময় যেকোনো চ্যানেলের টিআরপি বেড়েই চলেছে। আর সে নাটকে যদি সোফিয়া ডল থাকে তো কথাই নেই। এককালের সুফিয়া খাতুন ডলি এখনকার সোফিয়া ডল। ডলের জন্যই নাটকের জগত থেকে সিনেমায় আসা টয়ের। প্রথম সিনেমা 'বোমশেল'। সুপারডুপার হিট। ডলের সমুদ্র থেকে উঠে এসে দৌড়ের দৃশ্যটাই তো মাত করে দিয়েছে। সোফিয়া ডল কোথাও কোথাও সোফি ডল। বিশেষ করে বিদেশের লোকজনের সঙ্গে কোনো কাজে পরিচিত হওয়ার সময় নিজেকে এভাবেও বলে, দিস ইজ সোফি ডল। কখনো কখনো তাকে শুনতে হয়েছে, আর ইয়ু অ্যা ডল?! নো নো নো, ইয়ু আর নট সো লিটল। তুমি রীতিমতো বড়সড় মেয়ে। তুমি কী করে ডল হও! কিন্তু হ্যাঁ, মুখটায় একটা পুতুলের মতো মায়া আছে, সেই সঙ্গে আছে তীব্র একটা আবেদন। এই দুয়ের মিশ্রণ যে কী করে ওর মধ্যে ঘটল এটাই বিস্ময়ের। সবকিছুর ভেতরে একটা দীঘল ব্যাপার আছে। বিশেষ করে চুলে আর শরীরে সব গড়নে। এসবের এরকমের দীঘলতার সঙ্গে মুখটা কেমন যেন বেমানান হতে গিয়েও হয়নি। মাঝখানে একটু মুটিয়ে যেতে যেতেও যায়নি। কারণ টয় সব সময় তাকে খেয়াল রাখছে। একটু ভারী হলেই জানিয়ে দিয়েছে। 'তুমি আমার ওজন মাপার যন্ত্র নাকি?' ডল একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে। সাধারণত সেই উপরে উঠতে পছন্দ করে। ফলে ওজনটা সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে টয়ের সেই সময় কোনো কাজ পড়ে গেছে, আইফোনে সেটা করতে শুরু করেছে। এদিকে ডল দোদুলদোলে দুলেই যাচ্ছে তখন টয়ের উদাসীন হয়ে থাকাটা সময়টাকে আরো দীর্ঘ করে

দেয়। আর ডলের দীর্ঘ সময় না হলে হয় না কিছুই। সারাদিনের ক্লান্তি যেন আরো এক কঠিন পরিশ্রমের ভেতরে দিয়ে শীর্ষে পৌঁছে গিয়ে শান্ত হয়। মাঝে মাঝে দুজনেই আর পৌঁছাতে পারে না। সেটা দুজনেই চোখের ভাষা পড়ে নিতে পারে, বুঝতে পারে, টের পায়— আজ হয়নি। চরমের মাত্রা তারা ছুঁতে পারেনি। টয় বিষয়টা আরো ভালো করে বোঝে। রিনিয়াকেও সে অনেকের ভেতর থেকে বাছাই করে নিয়েছিল। আর শুরুতেই টের পেয়েছিল নায়িকাদের মতো দেখতে হলেও রিনিয়া শেষ পর্যন্ত ভীষণ ভালো বউ হওয়ার জন্যই জন্মেছে। এখন সে এক ছেলে ও এক মেয়ের মা। বাইরে আগের মতোই আছে। কেবল ভেতরে গনগনে আগুনটা কীভাবে কীভাবে কমে গেছে। ডলের কাছে ঠিক এই আগুনটাই পায়। আগুন পায় বলা ঠিক নয়, ডল স্বয়ং আগুনের কুণ্ড। সব কাঠমর কি লৌহময় ক্লান্তি সে পুড়িয়ে ছাই কি গলিয়ে তরল করে দিতে পারে। কেবল তাই নয়, টয়ের জন্য ডল পারে না এমন কিছু ছিল না একসময়। বিভিন্ন কোম্পানির হর্তাকর্তাদের কাছে, ধন্না দেওয়ার সময়, যাদের কৃপায় বেঁচে থাকা, গাড়ি বাড়ি সব, তাদের কাছে কেবল পায় ধরতে বাকি থাকত টয়ের, সেখানে ডলকে নিয়ে গেলে, তারাও গলে জল, জাদুর মতো হয়ে যেত সব। গাঢ়নীল স্কিনটাইট জিন্সে প্যান্ট, কালো জুতা, কালো টি-শার্টের ওপরে কোটি পরা ডলের কী এমন মন্ত্র আছে কে জানে? বা কখনো শাড়ি। স্লিভলেস বা অনেকটা পিঠ উদোম করা ব্লাউজের ট্রান্সপারেন্ট শাড়িতে থাকা ডল। বিজ্ঞাপনী সংস্থার মালিকেরাও ডলকে দিয়ে দারুণ সব প্রজেক্ট বের করে আনতে পেরেছে। এক অ্যাডফার্মের মালিক বলেছিল, 'পুঁজিপতিদের পকেট কেটেই তো আমাদের চলতে হয়!' ডল সবখানে তুরুপের তাস। এক একটা মহা মহা দান মারার পর কখনো ব্যাংকক, কখনো বালি, কখনো মরিশাস। হ্যাঁ, তার আগে পরে রিনিয়া আর বাচ্চাদেরও ঘুরিয়ে এনেছে এসব জায়গায়। রিনিয়াকে ডল ডাকে দিদি। ওপরে ওপরে দুজনের আহ্লাদের কোনো শেষ নেই। দামি দামি উপহার নিয়ে যাবে, যখনই রিনিয়া আর বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। আসলে ডলের নরম নরম কথা, কেমন একটা লাজুক লাজুক আচার ব্যবহারের সামনে কেউ কঠিন হতেই পারে না। — এটা একেবারে শুরু থেকে বুঝেছিল টয়। একটি পত্রিকা থেকে সাক্ষাৎকার নিতে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল : ডলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক? উত্তর : সে আমার আত্মার মানুষ। —বলতে গিয়েও বলতে পারেনি, বলতেই হয়েছে, আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। যদিও সে অন্য আরো অনেকের সঙ্গে কাজ করছে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার বোঝাপড়া শুরু থেকেই ভালো। প্রশ্ন : আপনিই তো ওকে আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন? উত্তর : না না, তা কেন হবে। সোফিয়া ডল এখন একটি ব্র্যান্ড। আর সে সবই অর্জন করেছে নিজের যোগ্যতায়। দেখুন, এই ইন্ডাস্ট্রি যখন প্রায় ধসে পড়ার দশা তখন বলতে গেলে সোফিয়ার মতো কজনই কিন্তু পুরো ভেঙে পড়া ইন্ডাস্ট্রিকে দাঁড়া করিয়ে দিয়েছে। — টয় শুরু থেকে জানতে কোনো কিছু দাঁড় করাতে পারলে নিজেরাও সেখানে দাঁড়িয়ে যায়। ডলের কারণেই এই মাঝারি ছোটখাটো আকারের তরিক রাফাত টয় নিজেই অনেকের কাছে বিস্ময়। দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। কৃষ্ণাঙ্গদের মতো কোঁকড়ানো চুল। চেহারাতেও নিগ্রোয়েট ধাঁচ আছে। সবচেয়ে ভালো জানে ডল নিজে। 'তুমি কিন্তু পুরোই শর্টি ম্যাক আছো। ও কোলাব্যাঙ। ও কোলাব্যাঙ। ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ!' বলতে বলতে আঙুলে খেলাত ডল। এটা আরেকটা ব্যাপার। কোনো কিছুতে কোনো ক্ষমাঘেন্না নেই ডলের। জামাকাপড়ের মতো যারা পুরুষ বদলায় তাদের মুখে শুনেছে, 'পর্নোছবি! অসহ্য!' তবে ডল বলে, 'তাই বলে সবার সামনে জেসমিন চৌধুরী, সানি লিয়ন হতে রাজি নই। তাছাড়া তুমি ভালো করেই জানো, আমি কিছুই হতে চাইনি। আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই, ছিল না, তাই কোনো কিছু নিয়ে ভয়ও নেই। আমি নিজের কাছে পুরাই মুক্ত, ম্যান। আমি কেয়ারলেস নই, আমি কেয়ারফ্রি।' টয় বলে, হ্যাঁ, 'তুমি তো ভিনি ভিডি ভিসি। এলাম দেখলাম জয় করলাম। কথাটা আমাদের জীবন থেকে জগৎ থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। সবখানে স্ট্রাগল। দিনের পর দিন কষ্ট করে তারপর যদি কিছু হয়। তাও হয় না। আর তুমি শুরু থেকেই সব অলিম্পিকের চূড়ায় নিয়ে গেছো। সিলটিয়স, আরটিয়স, ফর্টিয়স। ফাস্টার, হায়ার, স্ট্রংগার।' ডল হেসে হেসে বলে, 'ওই বিজ্ঞাপনের মতো শোনাচ্ছে।' টয় বলে, 'কোন বিজ্ঞাপন? ও বুঝেছি বুঝেছি— হরলিক্স। তা ঠিক।' ডল হাসির ভেতরেও মাঝে মাঝে কেমন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। বলে, 'দেখো, আমার গ্রামের মানুষগুলি এখনও কত কষ্টে আছে। আমি আমার বাবা মা ভাইকে ঢাকায় এনে রেখেছি। ভাইটা আই এল টি এস দিচ্ছে। ভালো করতে পারলে যেখানে চাইবে পাঠিয়ে দেব। কী স্বার্থপর আমরা, তাই না? তুমিও তোমার ছেলেকে দার্জিলিংয়ে পড়াচ্ছো। মেয়েটা ছোট বলে পাঠাওনি, তাই না?' টয় বলে, 'কী করব বলো। মানুষের সবার আগে চাই শিক্ষা। সেটাই আমরা পাইনি। এখানে এখনও তার সুযোগ হলো না। শিক্ষা পেতে হলে তো সভ্য হতে হয়, নাকি শিক্ষা পেলে তবে সভ্য হয়ে ওঠে। — ডিম আগে না মুরগি। সেই ধাঁধা। কিন্তু আমার মনে হয় আগে শিক্ষা। তবে সভ্য হওয়াটাও সঙ্গে থাকতে হয়। আমরা কেউ সভ্য হতে পারলাম না।' ডল আবার হালকা মেজাজে ফিরে আসে, 'তুমিতো আস্ত একটা অসভ্য! আর ওপরে দেখে মনে হয়, হাঁদারাম একটা!' নাক টিপে আদর করে ডল। হ্যাঁ, টয়ের বড় বড় চোখ গরুর মতো সান্ত্বতা সেখানে। ওদের ফিল্ম সোসাইটির গুরু জাফরান ভাই বলতেন, 'সত্যম শিবম সুন্দরম দিয়ে হবে না, শান্তম। শান্তম চাই। সুখের চেয়ে শান্তি বড়োরে।' ডল তখন আরো হালকা মেজাজে, 'তার চেয়ে বড় আমার কোলাব্যাঙ! ঘ্যাঙ্গর ঘ্যাঙ্গর ঘ্যাং!' গালে লাগিয়ে আদর। নাক দিয়ে আগাগোড়া ঘষা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত দিক থেকে দেখত ডল। সেই পুরোনো জিনিস বার বার নতুন করে দেখত। কেউ কারো কাছে পুরোনো না হওয়াটাই হলো সম্পর্কে আসল জাদু। তারপরও কোথাও একটা চোরাটান থাকে— এই ছাড়া ছাড়া ব্যাপারটাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার, একটি কিছু ধরে থিতু হওয়ার। নইলে ডল এমন ফাঁকি তাকে দেবে কেন? কোনো দিন তো জিজ্ঞাসা করতে হয়নি। সে নোরিক্স নিয়েছে কিনা? খেয়েছে কিনা? কারণ ডলের একদম রবার পছন্দ না। এতটুকু রবারের ব্যবধানও তার জন্য অনেক। সেটা অন্যদের জন্য। কদিন আগেও এক বিগশট বিজনেসম্যান তাকে হীরের পুরো সেট দিয়েছে। কে জানে না যে, এই মাংসের শরীর একদিন লোলচর্মময় হয়ে যাবে, হাড়ে জোর থাকবে না, কিছু ধরতে গেলে থর থর করে কাঁপবে হাত, মাটিতে হালকা করে পা রাখতে গেলে টলে উঠবে সারা শরীর। এই একই শরীর তো! তাই না। ওই যে রাজকাহিনিতে জয়া বলেনি কি ইন্দ্রনীলকে, 'চামড়া। কেবলই চামড়া!' কিন্তু এটা বাইরের। ভেতরে যেটা জন্মায়, মনে বা বাসনায়? সেটি কি কেবল চামড়ার জন্য? না, কোনো কিছুর জন্য নয়। বলতে গেলে এই প্রথম সুযোগটা এসেছে। আগে সবসময় সতর্ক থেকেছে। কখনোই কোনো ভুল করেনি। এটাও কোনো ভুল ছিল না। ইচ্ছা করেই নেওয়া ছিল সিদ্ধান্তটা। কেবল টয়কে জানানো ছিল না। কারণ সে রাজি নাও হতে পারত। কিন্তু টয় বলেছে, কেন আমি রাজি হতাম না। তুমি আমাকে একবার অন্তত বলতে। বলে দেখতে। আর এখন, তুমি বুঝতে পারো, তোমার এমন ক্যারিয়ার! ডল বলেছে, 'তাতে কী? জগতে সোফিয়া লরেনের মতো মানুষ, লিজ টেইলরের মতো মানুষ বা সেই মেরিলিন মনরোর মতো কেউ বা এই যে আমাদের সুচিত্রা সেন, শাবানা, ববিতা, কবরীর মতো কত কত মানুষ। জানতে চাওয়া হোক সন্তান তাদের ক্যারিয়ারের চেয়ে কম কিছু ছিল কিনা?' টয় অবশ্য জানে, এ লাইনের অনেকেই মা হতে পারেনি। একটার পর একটা সম্পর্ক ভেঙেছে-গড়েছে। কিন্তু মা না হতে পেরে ভেতরে ভেতরে কতটা ক্ষয়ে গেছে একেকজন, সেটা সে ছাড়া আর কেউ কি জানে? টয়ের মনেই হতো, ডলকে বোঝা যায় না যে সে হিসেবি কিনা। কিন্তু এখন ঠিকই বোঝা গেল— কতটা বুঝে শুনে পা ফেলে। যখন ঢাকায় তার নিজের ফ্ল্যাট, গাড়ি; একটা হাউজিং স্টেটে চার কাঠার মতো জমির মালিকানা, ব্যাংকে কয়েক কোটি টাকা, তখন এসব রিক্স নেওয়াই যায়। আর ডল একটা কথা স্পষ্ট বলেছে, 'কোলাব্যাঙ, আই লাভ ইয়ু মাই কোলাব্যাঙ।' একদিন বলেছিল, 'লোকজনের তো বাপ ডাকার কথা। বাপরে কী হোঁতকা এটা!' টয় নিজেও কোলাব্যাঙের মতোই বসতে পছন্দ করে। এভাবেই সে নিজেকে ধরে রাখতে পারে অনেকক্ষণ। ডল অবশ্য জানিয়ে রেখেছে শেষটাতে তাকে উপরে উঠতে দিতেই হবে। নইলে ঠিক ওই যে ইয়েটা আসে না। একটা কী যেন— বহু দূর থেকে বহু বহু অলিগলি নালী ধমনী শিরা উপশিরা ঘুরে প্রবল বেগে ছুটে এসে বিশাল জলোচ্ছ্বাসের এক মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পরম শান্তি পাবে, পরম একটা সুখে আত্মসত্তা অস্থিমজ্জা দুমড়ে-মুচড়ে উঠতে চাইবে— সেটা হয় না। নিজেকে পুরো নিঃশেষ করে দেওয়ার এই সুখ আর কোনো কিছুতে পাওয়া যায় না। সিনেমাটা তো স্রেফ ব্যবসা হয়ে গেছে। আগের সিনেমা কোথায়? সারা

পৃথিবীতে সিনেমার এক রকমের মৃত্যু ঘটে গেছে। পরিচালকরা কি সেই তুরীয় সুখটি পান সিনেমার সব কাজ শেষ করে সেটির চূড়ান্ত দশায় পৌঁছানোর পর? সব কিছুরই একটা চরমপুলক আছে, অর্গাজম আছে। নইলে এসব কিছুই কেউ করতে চাইত না। সেটা এখন স্রেফ লেনাদেনা। শোবিজের জগতে কারো সঙ্গে কারো সিরিয়াস অ্যাফেয়ার হয় না। যা হয় তা হলো বিনিময়। দেনা পাওনা। টয়ও অনেক দিন ধরেই এটাই মনে করে এসেছিল। রিনিয়াকে বিয়ে করার অন্যতম কারণ সে ভালো ছাত্রী ছিল। গণিতে মাথা ভীষণ ভালো ছিল। তাকে আরো পড়াতে পারত। কিন্তু টয় এখানে সেই আদ্দিকালের পুরুষের মতো ভীতু— যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় রিনিয়া। তাই দুমাদ্দুম দুটো বাচ্চা পরপর— একটা একটু বড় হয়ে উঠতেই আরেকটা। তাই নিজের আর বাচ্চা নেওয়ার কোনো ইচ্ছামাত্র ছিল না। কিন্তু ডল এটা কী করল! কিন্তু আসলে কি এটা তারই? সে বারবারই জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি এটা কী করলে? কী করলে তুমি এটা?' ডলের শান্ত উত্তর, 'আমি খুব বুঝে শুনেই করেছি।' সেদিন বেশ একটু ঝগড়া মতো হতে পারত। কিন্তু ডল এমন শান্ত ছিল যে ঝগড়া করা যায়নি। টয় বলেছিল, 'তো এখন কি তোমাকে বিয়ে করতে হবে?' ডল তখনও শান্ত, 'আমি কি একবারও বলেছি কথা?' সবচেয়ে বড় কথা তখনও কে জানত, ডলের এক অন্ধভক্ত ডাক্তার আছে। কেবল মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছে ছেলেটা। ছেলেই বলা যায়। ডলের একটা সিনেমা একটা নাটকও সে কোনো দিন দেখতে বাকি রাখেনি। তার সমস্ত ফ্যান্টাসি ডল। সোফিয়া ডল। ডলের সঙ্গে দেখা করে, যোগাযোগটাও সে তৈরি করেছে অনেক সময় নিয়ে। ডল তাকে বলেছিল, যে আমি যদি হঠাৎ কনসিভ করি। তো তুমি আমাকে সেই সন্তানসহ বিয়ে করতে পারবে? পারব। একদম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল। বড়লোকের ছেলে না হলেও ঢাকায় নিজেদের বাড়ি আছে। বাপ মায়ের দুদিকেই কেবল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসরে ভরা, মামাত খালাত চাচাত ফুপাত সব ভাইবোনের ভেতরে দুয়েকজন ছাড়া ব্রিলিয়ান্টদের ছড়াছড়ি, তেমন বংশের এই ছেলেটাকেই সবার আগেই জানিয়েছিল, 'আমি কিন্তু কনসিভ করেছি।' তাহমিদ বলেছে, 'তোমার জন্য আমি সব পারি। আর পুরো ব্যাপারটা তো বায়োলজিক্যাল। এর ভেতরে আমি অন্য কিছু খুঁজতে চাই না। ডারউইন মার্কস ফ্রয়েড ফ্রেজার আমার মোটামুটি পড়া। এতে পাপ বা অন্যায়ের তো কিছু দেখি না।' ডল অবশ্য তাহমিদের এসব ভাষা বোঝে না। কিন্তু একটা বিষয় খুব ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করেছে, সেটা হলো তাহমিদ কতটা তাকে চায়। এবং সেই চাওয়াটা কেবল ক্ষণিকের সাধ মেটানোর জন্য নয়, নিছক শরীরী বা যৌনটান নয়, জীবনের টানেই তাকে চায়। এর জন্য ঠিক টয়ের সঙ্গে রতির অল্প কদিন পরেই সে তাহমিদকে নিয়ে একটা রিসোর্টে গিয়েছিল। সেই সময়ের কদিন সে খুব হিসাব করে কোনো কিছুর জন্য কোনো শিডিউল রাখেনি। তাতেও রক্ষা হয়নি। অনেক পত্রিকায়র খবর হয়েছে 'উধাও সোফিয়া ডল!' 'আত্মগোপনে ডল' 'অজ্ঞাতবাসে সোফি ডল'। বাংলা সিনেমার নতুন ফেনামেনা সে। ঠিক এই সময় এমন কাণ্ড করে নিজেকে চিরদিনের জন্য এই জগৎ থেকে নির্বাসনে দিলো না কি? শোবিজের জগৎ কদিনের জন্য গুজবে-গসিপে মুখর। ডলের অবশ্য পরিকল্পনা ছিল। মানে আছে। এমনভাবে কাজটা করবে, যাতে টয় ও তাহমিদ দুজনেরই সম্ভাবনা থাকে। আর যদি দেখে এতে ক্যারিয়ারের ধস নামতে পারে তো তাহমিদকে বলবে, আগে তাকে যা যা করতে হয়েছে, তার কোনোটাই সে করা বন্ধ করবে না। যেখানে যেখানে যাকে যাকে যা যা কাজের জন্য সামাল দিতে হয়— সব কিছু তাকে করতে দিতে হবে। তাহমিদের তাতে কোনো আপত্তি নেই। যেকোনোভাবে হোক ডল তার হবে। ডলের জীবনের খাতাকলমে সেই হবে একমাত্র পুরুষ। শোবিজের জগৎ রাক্ষসে ভরা। শোবিজের জগতের গভীর রাজনীতির হাতেখড়ি সে টয়ের কাছেই শিখেছে। টয়ই তার গুরু। টয়ই তাকে সত্যিকারে সুখী করেছে সবদিক থেকে। বাতি সবগুলি ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়। তাহমিদ মোটামুটি। তবে ছেলেটাও দম আছে। টয় ও তাহমিদ ছাড়া অন্য অনুভব অনুভূতির দিক থেকে সবখানে একশভাগ নিজেকে দেওয়ার ছিল না, ফলে নেওয়ারও কিছু ছিল না। কেবল বস্তুগত হিসাব— দিলে পাবে— এই নিয়মটা ডল কোনোদিন ভুলেনি। টয় এ জগতের প্রবেশের শুরুতে এই মন্ত্রটা ওর কানে মনে আত্মসত্তায় গেঁথে দিয়েছে। বলতে গেলে এই নিয়ম মেনেই চলছে ডল। নিজেও ঠকেনি। অন্যরাও ঠকাতে পারেনি। দেবে নেবে, দিলে সব অর্গল তুলে দেবে। না দিলে, মুখের ওপরে খিল দেবে। নো এন্ট্রি। মাঝামাঝি পথ নেই। সব কিছু হার্ডকোর। জগৎ যদি তোমাকে নিয়ে খেলতে চায়, তুমিও খেলবে। যত বড় খেলা, তার তালে তাল মিলিয়ে তত বড় খেলোয়াড় হতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, তুমি কোন খেলা খেলতে চাও? খেলতে তোমাকে হবেই যদি কোনো একটা কিছু হয়ে উঠতে চাও। — এসব অনেক কথা শুরুতে টয় তাকে বলে নিয়েছিল। কখনো বুকের ওপরে নিয়ে, মুখের কাছে মুখ নিয়ে, যখন একজনের নিশ্বাস আরেক জনের নিশ্বাসের ভেতরে মিশে যাচ্ছে, তখনও। টয়ের হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে ডলের সারা শরীরের মহাদেশে। বাঁকে বাঁকে। ডলের ছড়ানো বিশাল পেছনটায় সোহাগ দিতে দিতে দলতে দলতে কত কথা। ডল আরামে মৃদু মৃদু আ উ ই ঈ শব্দের ভেতরে মরমের গহনে ঢুকে যাচ্ছিল বা ঢুকিয়ে নিচ্ছিল টয়ের কথাগুলি। কোলাব্যাঙ তখন হয়ত পেটের নিচে পরম তৃপ্ত হয়ে শান্ত ঘুম থেকে আবার একটু একটু করে জেগে উঠছে কি উঠছে না, কথার স্রোত থামছে না, কীভাবে কোথায় কেন কী কী করতে হবে বা হবে না। আয়নার দৃশ্যগুলি মনে ভেসে ভেসে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায় বাস্তবকে কল্পনাকে তখন সেসব কিছুই বোঝা যায়নি। এখন তৈরি হওয়া এই দূরত্বের ফিরে ফিরে টয়ের দৃশ্যগুলির কেমন ছায়ার মতো তৈরি হয়ে ফের মিলিয়ে গিয়ে আবার গড়ে উঠে ফের উবে যাচ্ছে। তাহমিদের ব্যাপারটা একদম কাউকে বলেনি ডল। নিজের কোনো কিছুই বলেনি কোনো দিন কাউকে। আজ থেকে পাঁচ বছর পর বা দশ বছর পর কোথায় নিজেকে কীভাবে দেখতে চায়, সে দেখাটা নিশ্চয় তার হয়ে অন্য কেউ দেখে দেবে না— এটা অন্তত ডল জেনেছিল। ফলে কে কার খেলনা, আর কে কার পুতুল— সে সম্পর্কে তলে তলে খুব খেয়াল রেখেছিল। তাকে কেউ ব্যবহার করে পার পেয়ে যাবে, নিজের ফিরে আসবে শূন্য ফাঁকা হাতে,— এমন বোকা ডল ছিল না কোনোকালেই। তবে মুখে মুখে অনেক কথাই বলেছে, আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ফলে ভয় নেই। আমি আমার করার কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারলেই খুশি।— এসব আসলে বলতে হয়। সবাই বলে। নইলে টিকে থাকা যায় না। নিজের পথ ও জায়গা কোনোটাই করা যায় না। দাবা খেলার চালের মতো এই জীবন। টাচ অ্যান্ড মুভ। 'ভাবিয়া করিও কাজ।'— করলে আবার ভাবতে হবে নতুন করে। 'করিয়া ভাবিও না'-র ব্যাপার নেই। ডল সবসময় নিজের ভুলগুলির ভেতরে ফুলগুলিও দেখতে পায়। তাতে টয় বা তাহমিদ খুব একটা আলাদা কিছু হয়ে ওঠে না।

> কে জানে না যে, এই মাংসের শরীর একদিন লোলচর্মময় হয়ে যাবে, হাড়ে জোর থাকবে না, কিছু ধরতে গেলে থর থর করে কাঁপবে হাত, মাটিতে হালকা করে পা রাখতে গেলে টলে উঠবে সারা শরীর। এই একই শরীর তো! তাই না। ওই যে রাজকাহিনিতে জয়া বলেনি কি ইন্দ্রনীলকে, 'চামড়া। কেবলই চামড়া!' কিন্তু এটা বাইরের। ভেতরে যেটা জন্মায়, মনে বা বাসনায়? সেটি কি কেবল চামড়ার জন্য? না, কোনো কিছুর জন্য নয়